মৌলিক উপাদান

নঈম সিদ্দিকী

চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান

নঈম সিদ্দিকী

আবদুল মান্নান তালিব অনূদিত
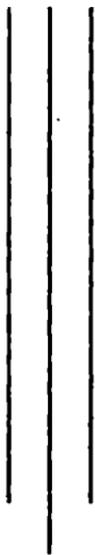
আই সি এস প্রকাশনী

চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান
মূল ঃ নঈম সিদ্দিকী
অনুবাদ ঃ আবদুল মান্নান তালিব

প্রকাশনায়
আই সি এস প্রকাশনী
৪৮/১ এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা -১০০০

প্রকাশকাল
১ম আইসিএস মুদ্রণ মে, ১৯৯০
সংযোজিত পুনঃমুদ্রণ : অক্টোবর, ২০০০
পুনঃমুদ্রণ জুলাই, ২০০১
পুনঃমুদ্রণ অক্টোবর, ২০০২
পুনঃমুদ্রণ জুলাই, ২০০৩

মুদ্রণে
জিসী প্রিন্টার্স
৩৮/২-খ বাংলাবাজার, ঢাকা
ফোন ঃ ৭১১১৫৭৮

দাম ঃ ৬ টাকা

Charitra Gathaner Mowlik Upadan—Noeem Siddiqee, Translated by Abdul Mannan Talib. 1st Edition May 1990, Latest Reprint October 2002. Published by I C S Prokashani, 48/1-A Purana Palton Dhaka-1000.
Price : 6/=

প্রকাশকের কথা

ইসলামী সমাজ বিপ্লবের লক্ষ্যে পরিচালিত আন্দোলনে কর্মীদের চরিত্রই মুখ্য হাতিয়ার। সেই শাণিত হাতিয়ার অর্জনের উপায়সমূহ সংক্ষিপ্ত, অথচ সুন্দরভাবে আলোচিত হয়েছে এই বইটিতে। যারা ইসলামকে একটা জীবনব্যবস্থা হিসেবে জীবনের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তাদের মধ্যকার প্রবল আগ্রহই আমাদেরকে বইটি পুনঃ প্রকাশে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছে বারবার। বইটি পড়ে তারা এর আলোকে চরিত্র গঠন করুক—এটাই আমাদের একান্ত কামনা।

লেখক পরিচিতি

নঈম সিদ্দিকী উপমহাদেশের ইসলামী আন্দোলনের একজন প্রথম সারির নেতা। বিশ শতকের প্রথমার্ধে বৃটিশ শাসিত ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অংগীকার নিয়ে আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর আহবানে সর্বপ্রথম মুষ্টিমেয় যে কয়জন মুজাহিদ এগিয়ে আসেন এবং তাঁদের সার্বিক যোগ্যতা, সামর্থ ও প্রচেষ্টা ইসলামী আন্দোলনের বুনিয়াদ রচনায় নিয়োজিত করেন–নঈম সিদ্দিকী তাঁদের অন্যতম।

আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী প্রতিষ্ঠিত মাসিক তরজমানুল কুরআন সম্পর্কে নিঃসন্দেহে বলা যায়, হিমালয়ান উপমহাদেশে বিশ শতকের ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এর অবদান সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর জীবদ্দশায় এবং তাঁর ইন্তিকালের পরও দীর্ঘকাল নঈম সিদ্দিকী এ আন্তর্জাতিক পত্রিকাটির সম্পাদনায় নিয়োজিত থাকেন এবং অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে নিজ দায়িত্ব পালন করেন।

উপমহাদেশে ইসলামী আন্দোলনের সূচনার পর এখানে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিভিন্ন অংগনে যে বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তন সূচিত হয় তা সার্বিকভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে সাহিত্য অংগনে এ সময় মার্কসবাদী ভাবধারার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল ব্যাপকভাবে। উর্দু, হিন্দি, বাংলা ইত্যাদি বড় বড় ভাষাগুলোর সাহিত্য অংগন মার্কসবাদী সাহিত্যিকদের ধর্মবিদ্বেষ ও শ্রেণী সংগ্রামে উচ্চকিত হয়ে উঠেছিল। তারা তাদের সাহিত্যের নাম দিয়েছিল প্রগতিবাদী সাহিত্য। সেক্ষেত্রে চল্লিশের দশকেই নঈম

সিদ্দিকীর কবিতায় ও গল্পে ধ্বনিত হয় সাহিত্যে প্রগতিবাদের নামে সার্বিক নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে ইসলামের মানবিক নৈতিকতাবাদ। এ সময় উর্দু কবিতায় ও কথা সাহিত্যে তিনি ইসলামের জিহাদী ও আন্দোলনমুখী চরিত্রের একটি জোয়ার সৃষ্টি করেন। তাঁর সাথে একদল কবি ও সাহিত্যিক এগিয়ে এসে এ ধারাকে পরিপুষ্ট করেন। তাদের এ ধারা 'ইসলামী আদব' তথা ইসলামী সাহিত্য নামে অভিহিত হয়। এ ধারার পৃষ্ঠপোষকতা করে নঈম সিদ্দিকীর প্রতিষ্ঠিত মাসিক পত্রিকা 'চেরাগে রাহ'। তিনি সুদীর্ঘকাল এ পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন।

নঈম সিদ্দিকী একাধারে কবি, উপন্যাসিক, গল্পকার, প্রাবন্ধিক, গবেষক। তবে পরবর্তীকালে ইসলামী মননশীল ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ সাহিত্য রচনায় তিনি আত্মনিয়োগ করেন। এ পর্যায়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাতের ওপর লেখা তাঁর 'মুহসিনে ইনসানিয়াত' নামক বিশাল সীরাত গ্রন্থটি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমগ্র জীবন ও কর্মকান্ডের আন্দোলন মুখরতা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের ও বাতিলের বিরুদ্ধে সত্যের সংগ্রামকে তিনি বিপুলভাবে উচ্চকিত করেন।

'চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান' পুস্তিকাটি নঈম সিদ্দিকীর লেখা একটি বিশেষ প্রবন্ধ। যা বিশ শতকের ষাট দশকের প্রথম দিকে উর্দুতে লাহোর থেকে প্রকাশিত হয় এবং ষাটের দশকেই বাংলায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়। মূল উর্দু প্রবন্ধটির নাম ছিল 'তা'মীরে সীরাত কে লাওয়াযিম'।

আবদুল মান্নান তালিব
১৭-০৯-২০০০

চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান

মানুষের তৎপরতা যত বৃদ্ধি পায়, যত অধিক গুরুত্ব অর্জন করে, সেখানে শয়তানের হস্তক্ষেপও ততই ব্যাপকতর হতে থাকে। এদিক দিয়ে বর্তমান যুগ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এ যুগে একদিকে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী ও স্বার্থপূজারী সভ্যতা আমাদের জাতির নৈতিক পতনকে চরম পর্যায়ে উপনীত করেছে, অন্যদিকে চলছে সমাজতন্ত্রের নাস্তিক্যবাদী চিন্তার হামলা। এ হামলা আমাদের জাতির মৌলিক ঈমান-আকীদার মধ্যে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করেছে। এর ফলে ইসলামের সাথে জাতির গভীর প্রেম-প্রীতিময় সম্পর্কের ভিত্তি নড়ে উঠেছে। বিপর্যয় ও অনিষ্টকারিতার 'সিপাহসালার' শয়তান যে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল হুবহু তারই চিত্র যেন আজ ফুটে উঠেছে। শয়তান বলেছিল ঃ আমি (হামলা করার জন্যে) এদের (মানব জাতির) সামনে থেকে আসবো, পিছন থেকে আসবো, ডান দিক থেকে আসবো, বাম দিক থেকে আসবো।*

এ অবস্থায় আমাদের অনেক কল্যাণকামী বন্ধু দুনিয়ার ঝামেলা থেকে সরে এসে সংসারের একান্তে বসে কেবল নিজের মুসলমানিত্বটুকু বজায় রাখার জন্য প্রচেষ্টা চালাবার উপদেশ দান করে থাকেন। অবশ্য এ অবস্থার মধ্যে অবস্থান করা মামুলী ব্যাপার নয়। সাধারণ অবস্থায় প্রত্যেক সৎ ব্যক্তি নৈতিকতার আদর্শকে কায়েম রাখে। কিন্তু নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলার প্রবল বাত্যা পরিবেষ্টিত হয়ে উন্নত নৈতিক বৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা চাট্টিখানি কথা নয়।

---

* *সূরা 'আরাফ : ১৭*

কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক যদি মহামারি আক্রান্ত এলাকা থেকে দূরে অবস্থান করে নিজেদের স্বাস্থ্যোন্নতির কাজে ব্যাপৃত থাকে এবং নিশ্চিন্তে মহামারিকে নৈতিক মৃত্যুর বিভীষিকা চালিয়ে যাবার ব্যাপক অনুমতি দান করে, তাহলে আমাদের মতে এর চাইতে বড় স্বার্থপরতা আর হতে পারে না। মাজারের নিকট যে সকল মূল্যবান প্রদীপ ও স্বর্ণনির্মিত বাতিদান অযথা আলোক বিচ্ছুরণ করে; অথচ তাদের সন্নিকটে বনে-জঙ্গলে মানুষের কাফেলা পথভ্রষ্ট হয়ে দস্যুহস্তে লুণ্ঠিত হয়, সেই প্রদীপ ও বাতিদানের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব যেমন সমান মূল্যহীন, ঠিক তেমনি যে ঈমান, ইসলাম ও তাকওয়া চতুষ্পার্শ্বের পরিবেশকে আলোকিত করার জন্য কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার পরিবর্তে বিরোধী শক্তির ভয়ে মসজিদে আশ্রয় খুঁজে ফেরে, তাও হৃদয়-মনের জন্য নিছক স্বর্ণালঙ্কার বৈ আর কিছুই নয়। চরিত্রের যে 'মূলধন'কে ক্ষতির আশংকায় হামেশা সিন্দুকের মধ্যে তালাবদ্ধ করে রাখা হয় এবং যা হামেশা অনুৎপাদক (Unproductive) অবস্থায় বিরাজিত থাকে, সমাজ জীবনের জন্যে তার থাকা না থাকা সমান। মুসলমান নারী-পুরুষ এবং মুসলিম দলের নিকট চরিত্র ও ঈমানের কিছু 'মূলধন' থাকলে তাকে বাজারে আবর্তন (Circulation) করার জন্যে ছেড়ে দেওয়া উচিত। তারপর মূলধন নিয়োগকারীদের মধ্যে যোগ্যতা থাকলে সে মূলধন লাভসহ ফিরে আসবে, আর অযোগ্য হলে লাভ তো দূরের কথা আসল পুঁজিও মারা পড়বে। কিন্তু বাজারে আবর্তিত হতে থাকার মধ্যেই পুঁজির স্বার্থকতা। অন্যথায় যত অধিক পরিমাণ পুঁজিই জমা করা হোক না কেন তা পুরোপুরি ব্যর্থ হতে বাধ্য।

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীগণ যখন তাদের চরিত্র ও ঈমানের ন্যূনতম পুঁজি এ পথে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, তখন একে কেবল ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাবার জন্যই নয়; বরং দেশ ও জাতির এবং আমাদের নিজেদেরকেও এ থেকে অধিকতর মুনাফা অর্জনের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। একজন স্বল্প পুঁজিদার ব্যবসায়ীর ন্যায় আমাদের রক্ত পানি করা উপার্জনকে ব্যবসায়ে খাটাবার ব্যাপারে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। এর পরিচালনা ও দেখা-শুনার জন্য যাবতীয় উপায়ও অবলম্বন করা কর্তব্য। মহামারী আক্রান্ত এলাকায় জনগণের সেবা করার জন্য আমাদের নিজেদের স্বার্থরক্ষার সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

আল্লাহর সাথে যথাযথ সম্পর্ক

আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনই হচ্ছে এ কঠিন পরীক্ষাক্ষেত্রে আমাদের প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন। এ সম্পর্ক তার প্রত্যাশিত সর্বনিম্নমানের নীচে নেমে আসলে আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ও তৎপরতা দুনিয়াদারীর রঙে রঙিন হয়ে উঠবে এবং শয়তানের জন্য আমাদের হৃদয়-মনের সমস্ত দুয়ার খুলে যেতে পারে। অতঃপর গোনাহের সৈন্যদের বিবেকের দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশের পথে আর কোন বাঁধা থাকে না। আল্লাহর সাথে সম্পর্ককে প্রতিষ্ঠিত রাখার এবং তাকে ভবিষ্যত বিভিন্ন পর্যায়ের প্রয়োজন অনুযায়ী তরক্কী দেবার জন্য কমপক্ষে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের প্রতি অধিক দৃষ্টিদান অপরিহার্য ঃ

১। আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে আমাদের আন্দোলনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত কোন কর্মী মৌলিক ইবাদতসমূহ পরিত্যাগ করেন নি। কিন্তু কেবল ইবাদত অনুষ্ঠানই যথেষ্ট নয়, বরং এ ব্যাপারে পূর্ণ নিয়মানুবর্তিতা এবং এই সঙ্গে আল্লাহর ভয়ে ভীত হবার ও তার সম্মুখে নত ও বিনম্র হবার গুণাবলীও সৃষ্টি হওয়া উচিত। এ ব্যাপারে আমরা এখনও কাঙ্ক্ষিত মানের সব চাইতে নীচে অবস্থান করছি। এটা এমন একটি দুর্বলতা যে, এর উপস্থিতিতে যদি আমরা বড় বড় সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ি॥বলাবাহুল্য যে জীবন সংগ্রাম থেকে আমরা আলাদা থাকতে পারি না॥তাহলে আমাদেরকে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা নামাজ, রোজা, হজ্ব ও যাকাত অনুষ্ঠানের জন্য যে সকল বিধি-বিধান দান করেছেন এবং এগুলোর মাধ্যমে যে সকল অবস্থা সৃষ্টির প্রত্যাশা করেন; কুরআন ও হাদীসের সাহায্যে আমাদের সহযোগীদের সেগুলো অবগত হওয়া, অতঃপর সে সব যথাযথ ভাবে সম্পাদনের ব্যবস্থা করা উচিত। বিশেষ করে নামাজ আদায়ের ব্যাপারে সময়ের প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। জামায়াতের সাথে নামাজ আদায়ের লোভ যদি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি না হয় তাহলে নামাজে আল্লাহভীতি, নতি ও বিনম্র ভাব সৃষ্টি হওয়া কঠিন। এ

কথাও মনে রাখা দরকার যে, ইবাদতের সাথে সাথে আত্মবিচারে অভ্যস্ত না হলে ইবাদতের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার সম্ভব নয়। আত্মবিচারের অনুপস্থিতিতে ইবাদতের বাইরের কাঠামো যতই পূর্ণাঙ্গ হোক না কেন তা অন্তঃসারশূন্যই থেকে যায়।

২। আল্লাহর সাথে সম্পর্কের বিকাশ ও পরিপুষ্টি সাধনের জন্য কুরআন ও হাদীস সরাসরি অধ্যয়ন করা উচিত। কুরআন ও হাদীসে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বর্ণিত শিক্ষার উপর যে দলের সমগ্র প্রচেষ্টা-তাৎপরতা নির্ভরশীল, সে দলের কর্মীগণ যদি প্রত্যহ ঈমান ও জ্ঞানের ঐ উৎসদ্বয়ে অবগাহন করার চেষ্টা না করেন, তাহলে যে কোন মুহূর্তে তাদের বিপথে পরিচালিত হবার সম্ভাবনা আছে। আধুনিক যুগের জনপ্রিয় জাহেলিয়াতসমুহের যে সকল অন্ধকার গলিপথ আমাদের অতিক্রম করতে হবে এবং সাহিত্য-শিল্প জ্ঞানের অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বিপদসংকুল বনপথে যে সকল দস্যু দলের ব্যূহভেদ করে আমাদের অগ্রসর হতে হবে তার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, দ্বীনি শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রদীপ হাতে না নিয়ে আত্মবিশ্বাসের সাথে এক ফার্লং পথও অতিক্রম করা সম্ভবপর নয়।

যে আদর্শ ও মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা প্রচেষ্টারত তার তাৎপর্য ও দাবীসমূহ সরাসরি তার আসল উৎস থেকে জানবার জন্য আমাদেরকে কিছু সময় অন্তত এক-আধ ঘন্টা বা পনের-বিশ মিনিট ব্যয় করা উচিত। খুব বেশী সম্ভব না হলেও প্রত্যহ যদি মাত্র একটি আয়াত ও একটি হাদীস পাঠ করি, তার অর্থ পুরোপুরি অনুধাবন করে বাস্তব জীবনে তাকে কার্যকরী করতে প্রয়াস পাই; তাহলে ইনশাআল্লাহ হকের এ ঔষধগুলো পরিমাণের স্বল্পতা সত্ত্বেও তাদের ধারাবাহিকতার কারণে আমাদেরকে আদর্শবিরোধী পরিবেশের বিষবাষ্প থেকে রক্ষা করবে।

যে সকল বই-পত্র কুরআন-হাদীস বুঝার ব্যাপারে সাহায্য করে, বিশেষ করে ইসলামী আন্দোলনের বই-পত্রগুলো নিয়মিতভাবে অধ্যয়ন করা উচিত। অনেক কর্মী কিছু কিছু বই-পত্র অধ্যয়ন করে একেবারে নিশ্চিত হয়ে গেছেন এবং আর বেশী অধ্যয়ন করার তাগিদ অনুভব করছেন না। তারা মনে করেছেন যে, তারা আন্দোলন ও সংগঠনকে পুরোপুরি বুঝে নিয়েছেন। অথচ

এটা তাদের নেহায়েত ভুল ধারণা বৈ আর কিছু নয়। কিছু কর্মী এমনও আছেন যারা কয়েক বছর আগে একবার যে বইগুলো পড়ে নিয়েছেন, সেগুলো পুণর্বার পড়ে নতুনভাবে প্রেরণা সৃষ্টি করার প্রয়োজনবোধ করেন না অথচ সমস্ত বই-পত্র পড়া এবং বার বার পড়া অত্যন্ত জরুরী।

৩। আল্লাহর সাথে সম্পর্ককে সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে **নফল ইবাদতের উপর যথাসম্ভব গুরুত্বারোপ** করা প্রতি যুগের ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য অপরিহার্য বিবেচিত হয়ে এসেছে। নফল ইবাদত নিয়মিতভাবে করা এবং এ ব্যাপারে বিশেষ করে গোপনীয়তা রক্ষা করা প্রয়োজন। নফল ইবাদতের মধ্যে নফল নামাজ, বিশেষ করে তাহাজ্জুদ নামাজের স্থান অতি উচ্চে। তাহাজ্জুদ নামাজ ইসলামী আন্দোলনের সৈন্যদের জন্য কঠিন পর্যায় অতিক্রমে সর্বোত্তম সহায়কে পরিণত হয়।

নফল ইবাদতের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান হচ্ছে নফল রোজার। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় করার জন্য এটি উত্তম উপায়। মাসে তিন দিন রোজা রাখা সুন্নত, বরং এক যুগ রোজা রাখার সমান। এছাড়াও হাদীসে বিশেষ বিশেষ দিবসে রোজা রাখাকে পছন্দনীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মোটামুটিভাবে এ ব্যাপারে নরম নীতি অবলম্বিত হয়েছে। প্রতি দশ দিনে বা প্রতিমাসে একদিন নফল রোজা রাখা যেতে পারে।

নফল ইবাদতের মধ্যে আল্লাহর পথে অর্থব্যয় করার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের উপার্জন তথা অর্থের একটি অংশ দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োগ করার জন্য পৃথক করে রাখতে অভ্যস্ত হতে হবে। এছাড়া আমাদের আন্দোলনের মূলে পানি সিঞ্চন করার দ্বিতীয় কোন পথ নেই। বরং এ কথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, বর্তমানে কাজের এমন সব পর্যায় দেখা দিচ্ছে যেখানে হয়ত নিজেদের সৌন্দর্যোপকরণসমূহ বিক্রি করে আমাদেরকে আল্লাহর দ্বীনের জন্য রসদ যোগাতে হবে। আমরা জানি আমাদের বন্ধুদের অধিকাংশই গরীব, মুষ্টিমেয় কয়েকজন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এবং পার্থিব স্বার্থ থেকে দূরে অবস্থানকারী। এ আন্দোলনের পিছনে ধনিক শ্রেণীর কোন সমর্থন নেই। এ

অবস্থায় আমাদের সদস্য ও সমর্থকগণ যে পর্যায়ের আর্থিক কুরবানী করে বায়তুলমালকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, কোন পার্থিব স্বার্থভোগী দল তার নজীর পেশ করতে পারবে না। কিন্তু আল্লাহ জানেন, নবীর (সা) সাহাবাগণ আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করার যে নজীর উপস্থাপন করেছেন আমাদের এ আর্থিক কুরবানী তার তুলনায় এখনও অনেক নিম্নমানের। চিন্তা করুন! বর্তমানে আমরা যে নাজুক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছি, সেখানে যদি বায়তুলমালে প্রয়োজনীয় পরিমান খাদ্য সরবরাহ না হওয়ার কারণে আন্দোলনের শিরা-উপশিরায় রক্ত সঞ্চালিত হতে না পারে এবং নিছক এতটুকুন কারণে আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহর নিকট আমরা কি জবাব দেব। তাই আমাদের আল্লাহর পথে অর্থব্যয় করার প্রেরণাকে আরো শক্তিশালী করতে হবে।

৪। আল্লাহর সাথে সম্পর্কের জন্য সার্বক্ষণিক যিকির ও দোয়া হচ্ছে একটি মৌলিক প্রয়োজন। আল্লাহর নবী (সা) সংসার ত্যাগের ধারণা মিশ্রিত যিকিরের পরিবর্তে তাঁর উম্মতকে দিবা-রাত্রের প্রত্যেকটি কাজের জন্য অসংখ্য দোয়া ও যিকির শিখিয়েছেন। এগুলো যেন শয়নে, জাগরণে, চলাফেরায়, ওঠা-বসায় তথা প্রত্যেকটি কাজে জারী থাকে।

ঘুম থেকে উঠার জন্য, ঘর থেকে বের হবার জন্য, ঘরের মধ্যে প্রবেশ করার জন্য, কোন আনন্দ মূহুর্তে, কোন দুঃখ-কষ্টের সময়, কোন ত্রুটি সাধিত হলে, কোন কাজ শুরু করার জন্য, আজান শুনে, ওজু করার সময়, হাঁচি দিলে, মুসলমান ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত হলে, পানি পান করার সময়—অর্থাৎ ছোট-বড় প্রত্যেকটি কাজে রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর যিকির ও তাঁর নিকট দোয়ার জন্য বহু ছোট ছোট সুন্দর কথা শিখিয়েছেন। সজ্ঞানে ও সচেতন মনে এ কথাগুলি উচ্চারণ করার সময় মুসলমান নিজেকে তার প্রভু ও মালিক আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত রাখে। আল্লাহকে ভুলে দুনিয়ার কর্মব্যস্ততার মধ্যে সে কখনও নিজেকে হারিয়ে ফেলে না। যিকির ও দোয়ায় তার জীবন ভরপুর হয়ে উঠে।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে কখনো সুবহানাল্লাহ (আল্লাহ সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি, ক্ষতি, স্বল্পতামুক্ত পাক পবিত্র), কখনো আলহামদুলিল্লাহ (সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য), কখনো আস্তাগফিরুল্লাহ (আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাচ্ছি), কখনো লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন শক্তি সহায় নেই), কখনো সাদাকাল্লাহু ওয়া রাসূলুহু (আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন), কখনো রাব্বিগফির ওয়ারহাম (হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করো এবং আমার প্রতি রহম করো), কখনো আনতা অলীয়্যী ফিদ্ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ (হে আল্লাহ! দুনিয়া ও আখেরাতে তুমিই আমার একমাত্র বন্ধু), কখনো হাসবিয়াল্লাহু রাব্বি (আমার মালিক আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট), কখনো নেয়মাল মাওলা ওয়া নেয়মাল ওয়াকিল (আল্লাহ আমার সর্বোত্তম বন্ধু ও শ্রেষ্ঠ সহায়) বলতে থাকে এবং তা আন্তরিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বলতে থাকে।* এভাবে নিজের সর্বশক্তিমান মালিক ও প্রভুর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে সে প্রতি পদে পদে সেই মহান সর্বশক্তিধর, সত্ত্বার নিকট সৎকর্ম করার জন্য শক্তি সময় সুযোগ কামনা করে। তাঁর নিকট থেকে পথের সন্ধান লাভ করে, কল্যাণ কামনা করে, শয়তানের তৎপরতার মুকাবিলায় তাঁর নিকট আশ্রয় চায়, নিজের ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত হয়ে তাঁর নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হয়। এমনিভাবে তার সমগ্র জীবন যিকির, কল্যাণ ও ন্যায়-নিষ্ঠতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠে।

---

* যিকির ও দোয়াগুলোর আরবীরূপ ঃ

١) سُبْحَانَ اللّٰهِ ٢) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ٣) اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ ٤) لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ٥) صَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ٦) رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ ٧) اَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ٨) حَسْبِيَ اللّٰهُ رَبِّيْ ٩) نِعْمَ الْمَوْلٰي وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ -

আমাদের প্রত্যেক কর্মীর জন্য এ ধরনের সচেতন মনে সার্বক্ষণিক যিকিরে অভ্যস্ত হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। উপরন্তু প্রতিমুহূর্তে নিজের ঈমান, চরিত্র, ছবর, তাওয়াক্কুল, সংযম ও নিয়মানুবর্তিতার দৃঢ়তা ও শক্তি বৃদ্ধির জন্য দোয়া করা উচিত। এ শক্তি যে কোন সংগ্রামে অত্যন্ত প্রভাবশালী প্রমাণিত হতে পারে।

বলাবাহুল্য, যে যিকির ও দোয়া সচেতন মনের অভিব্যক্তি নয়, যার সাথে মানসিক অবস্থার যোগ নেই, যা আল্লাহর উপস্থিতির অনুভূতিহীন, যা প্রদর্শনেচ্ছার কলুষযুক্ত এবং নিছক স্নায়ুবিক ব্যায়ামের পর্যায়ভুক্ত, তা থেকে আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ সম্ভব নয়। কাজেই যিকির-দোয়া, চিন্তা ও চেতনার সাথে হওয়া উচিত এবং সাথে সাথে প্রদর্শনেচ্ছা থেকেও মুক্ত হওয়া উচিত।

সংগঠনের সাথে সম্পর্ক

কোন দলের সাংগঠনিক ব্যবস্থা যদি ঢিলে থাকে এবং এ অবস্থায় সে কোনো বিরাট অভিযানে অংশগ্রহণ করে তাহলে তার অবস্থা হয় ঠিক এমন একটি মোটর গাড়ীর ন্যায়, যার কলকজাগুলো ভালভাবে আঁটা হয়নি, অথচ ড্রাইভার এ গাড়ী নিয়ে পার্বত্য পথ অতিক্রম করার জন্য বের হয় এবং পদে পদে অসুবিধার সম্মুখীন হয় এমনকি গাড়ীর মেশিন একেবারে অচল হয়ে পড়ে।

সংগঠন প্রত্যেক দলের একটি স্বাভাবিক প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের নিকট তা কেবল একটি স্বাভাবিক প্রয়োজনই নয় বরং আমাদের দ্বীনদারী, নৈতিকতা, আল্লাহর ইবাদত ও রসূলের আনুগত্যেরই মূর্তপ্রকাশ। সাংগঠনিক দুর্বলতা কাজের পথে নানান অসুবিধার সৃষ্টি করে। তাই বিভিন্ন দল এই দুর্বলতা দূর করার জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু আমরা মনে করি যে, এটা আমাদের পরকালীন ক্ষতির কারণ হবে। এ উদ্দেশ্যে আমরা একে হামেশা পরিত্যাজ্য মনে করি। তাই সংগঠন শৃঙ্খলাকে মজবুত করা এবং প্রত্যেক সহযোগীকে এর প্রহরায়

নিযুক্ত হওয়া নিজের দায়িত্ব মনে করা অপরিহার্য। সংগঠন সম্পর্কে এখানে কতিপয় গুরুত্বপূর্ন বিষয়ের অবতারণা করছি।

১। আদেশ ও আনুগত্যের ভারসাম্য সংগঠনের মেরুদণ্ড। এ ভারসাম্য ছাড়া আদতে সংগঠনের অস্তিত্বই অর্থহীন। এ জন্যই এ আদেশ আনুগত্যের ভারসাম্য নষ্ট কয়া গুনাহ্ করার শামিল। অথাৎ এটা হচ্ছে আল্লাহ ও রাসূলের (সা) নাফরমানী। এ অপরাধ অনুষ্ঠানের পর মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতে সাফল্য লাভ করতে পারে না। কুরআনের দাবী হচ্ছে-

اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ -

অর্থাৎ "আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং আনুগত্য কর তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বশীলদের।" *সূরা নিছা, আয়াত ঃ ৫৮*

মনে রাখবেন এ তিনটি আনুগত্য হচ্ছে ওয়াজিব। এর মধ্য থেকে কোন একটির আনুগত্য পরিহার করলে মুসলমান ক্ষতির সম্মুখীন হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেই বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করে, সে আল্লাহর আনুগত্য করে এবং যে আমার নাফরমানী করে সে আল্লাহর নাফরমানী করে। আর যে আমার (অর্থাৎ রাসূলের নিযুক্ত অথবা তাঁর আনুগত্যকারী) আমীরের আনুগত্য করে, সে আমার আনুগত্য করে এবং যে আমার আমীরের নাফরমানী করে, সে আমার নাফরমানী করে।"

হযরত আবু হুরায়রার (রাঃ) একটি বাণী এ কথাটিকে আরো সুস্পষ্ট করে। তিনি বলেছেন ঃ "এ কথা সন্দেহাতীত সত্য যে, নেতৃবৃন্দের আনুগত্য আল্লাহর আনুগত্য এবং তাদের নাফরমানী আল্লাহর নাফরমানীর নামান্তর।"

এই প্রসঙ্গে হাদীসের পুস্তকসমূহে চূড়ান্ত নির্দেশসম্বলিত অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এই হাদীসগুলোর বক্তব্য হচ্ছে এই যে, ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা বা দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের জন্য ইসলামী আইন ও সংবিধানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের যে সকল লোককে ইসলামী নেতৃত্বের বিশিষ্ট গুণাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে উন্নত মানের ইলম ও তাকওয়ার অধিকারী হবার

কারণে নেতৃত্বের পদে নির্বাচন করা হয়, সৎকর্মসমূহে তাঁদের আনুগত্য করা শরীয়তের অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ ফরজ ও ওয়াজিবসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

এজন্য রাসূলুল্লাহ (সা) দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে, নাককাটা হাবশীকেও যদি নেতৃত্বের পদে সমাসীন করা হয়, তাহলে তার চেহারা-সুরত, তার বংশ গোত্রগত মর্যাদা, তার আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, তার রুচি, অনুভুতি ও আবেগ যতই পৃথক ও বিশিষ্ট হোক না কেন এবং এ জন্য তা কোন ব্যক্তির নিকট চরম অপ্রিয় হলেও তাঁর পূর্ণ আনুগত্য অপরিহার্য। রাসূলুল্লাহ (সা) এ কথাও বলেছেন যে, আমীরের আনুগত্যের এই দাবীকে যারা অস্বীকার করবে, তারা বিপুল তাকওয়ার অধিকারী হলেও আখেরাতে তাদের সাফল্যের কোন সম্ভাবনা নেই। তিনি বলেছেন ঃ

"যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে সে কেয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে, যখন (নিজেকে ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করার জন্য) তার নিকট কোন দলিল প্রমাণ থাকবে না।"

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে এ কথা আন্দাজ করা যেতে পারে যে, ইসলামী দল ও সংগঠনের পরিচালক ও নেতৃবৃন্দ সাধারণ দুনিয়াপরস্ত রাজনৈতিক দলসমূহের সভাপতি, সহ-সভাপতি ও তাঁদের উপদেষ্টাগণের সমপর্যায়ভুক্ত নন। বরং এখানে পরিচালকবৃন্দ ও কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্যগণ একটি বিশেষ দ্বীনি শরিয়তভিত্তিক মর্যাদার অধিকারী হন। তাঁদের অধিকার ও কর্তব্যসমূহও সাময়িক সুযোগ-সুবিধার ভিত্তিতে নয় বরং দ্বীন ও শরিয়তের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। এ কারণে তাঁদের আনুগত্যের ব্যাপারটি ঠিক সাধারণ রাজনৈতিক দলসমূহের নেতৃবৃন্দের আনুগত্যের সমপর্যায়ভুক্ত নয়।

যতক্ষণ নেতৃবৃন্দ কুরআন ও সুন্নাহর পথ থেকে প্রকাশ্যভাবে সরে না দাঁড়ান ততক্ষণ তাঁদের নির্দেশ লংঘন করা অথবা সানন্দে ও সাগ্রহে তাঁদের আনুগত্য করার পরিবর্তে অসন্তুষ্ট চিত্তে আনুগত্য করা, অথবা তাঁদের কল্যাণ কামনার পরিবর্তে তাঁদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ করা, তাঁদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

করা, তাঁদের গীবত করা, তাঁদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ সৃষ্টি করা, তাঁদেরকে যথার্থ অবস্থা ও ঘটনাবলী সম্পর্কে অবগত না করা, সঠিক পথে চলার জন্য নির্ভুল পরামর্শ দানের ব্যাপারে কার্পণ্য করা এবং তাঁদের গোপন কথাসমূহ প্রকাশ করে বেড়ানো কবীরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত হবে। এগুলো এমন পর্যায়ের কবীরা গুনাহ যে, এগুলোর কারণে ইবাদত-বন্দেগী অনুষ্ঠান ও সাধারণ চরিত্র সংশোধন সত্ত্বেও মানুষের আখেরাত বিনষ্ট হতে পারে। এই ভয়াবহ অবস্থা মানুষকে মুনাফেকীর পর্যায়ে নামিয়ে দিতে পারে। তাই ইসলামী দল ও সংগঠনের মধ্যে অবস্থানকারীদের আনুগত্যের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে।

২। ইসলাম অবশ্য কখনো অন্ধ আনুগত্যের দাবী করে নি। বরং সে কেবল সৎকর্মের' ক্ষেত্রে আনুগত্য চেয়েছে। 'সৎকর্মের' সীমার বাইরে তার নির্দেশ হচ্ছে ঃ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"গুনাহ ও আল্লাহ নির্ধারিত সীমালঙ্ঘনমূলক কাজে পরস্পরের সহযোগী হয়ো না।"

সূরা মায়েদা, আয়াত ঃ ২

ইসলামী দল ও সংগঠনের আভ্যন্তরীণ তাগিদেই তার সদস্যবৃন্দকে দলীয় কার্যাবলীর প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখতে হবে। এবং দলের পরিচালকগণকে সৎকর্মের সীমার বাইরে কদম রাখা থেকে বিরত রাখতে হবে। এ সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেনঃ "বন্ধুগণ! তোমাদের কেউ যদি আমার নীতি বা কাজে বক্র দেখে তাহলে আমার এই বক্রতাকে সোজা করে দেয়া তার কর্তব্য হয়ে দাঁড়াবে।"

এই প্রসঙ্গে কোন খুঁটিনাটি ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দিলে, তা দূর করার জন্য তাকে পেশ করার, সে সম্পর্কে আলোচনা করার এবং সন্তোষজনক প্রত্যুত্তর না পেলে তার উপর অবিচল থাকার শরিয়তভিত্তিক অধিকারও দলের সদস্যবর্গের আছে। কিন্তু পরিচালকবৃন্দের পক্ষ থেকে যে সিদ্ধান্ত কার্যকরী হয়, একমাত্র তারই আনুগত্য করতে হবে। আমার মতের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত

গৃহীত হলো কেন ? এবং আমি যে দৃষ্টিতে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করি সে দৃষ্টিতে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হয় নি, নিছক এতটুকু কারণে আনুগত্য অস্বীকার করা যেতে পারে না। আনুগত্যের শৃঙ্খলা একমাত্র তখনই ছিন্ন করা যেতে পারে যখন রাসূলুল্লাহর (সা) ভাষায় ইসলামের পথ ছেড়ে পরিষ্কারভাবে অন্য পথ অবলম্বিত হয়।

দায়িত্বশীল ব্যক্তিদেরকে হক পথে রাখার জন্য তাঁদের সমালোচনা করাও কর্মীদের একটি মৌলিক অধিকার । কিন্তু অন্যান্য দলে সন্দেহ ও সংশয়ের ভিত্তিতে সমালোচনা করার নীতি স্বীকৃত হলেও ইসলামী দলের জন্য এ নীতি অনৈসলামিক বলে বিবেচিত হয়। ইসলামী দলে সমালোচনা হয় সু-ধারণার ভিত্তিতে। এখানে আপত্তি ও অভিযোগের পরিবর্তে কল্যাণকামিতা ও সৎপরামর্শের সুর ধ্বনিত হয়। ইসলামী জামায়াতের সাথে সমালোচনায় কেবল এমন পদ্ধতিই খাপ খেতে পারে যেখানে সমালোচকের মনে কোন প্রকার তিক্ত ভাব থাকে না এবং শ্রোতার মনেও সমালোচনা বিরক্তি উৎপাদন করে না, যেখানে সমালোচনার সাথে কোন প্রতিশোধ স্পৃহা শামিল থাকে না এবং যেখানে নিজের কথাকে স্বীকার করিয়ে নেবার জিদের প্রভাব থাকে না এবং সমালোচনা গ্রহণ না করার ফলে সমালোচক দুঃখিত বা বিরক্ত হয় না। উপরন্তু ইসলামী দলে সমালোচনা হয় মুখোমুখী, সামনা সামনি; পিছনে গিয়ে বা অন্তরালে থেকে কারুর সমলোচনা হয় না। পিছনে কিছু বললে তা সমালোচনা নয়, গীবত হয়। গীবত ইসলামী দলের প্রতি পয়লা নম্বরের অনিষ্টকারিতার পরিচায়ক। অথচ সমালোচনা তার সর্বোত্তম কল্যাণ কামনার পরিচয় বহন করে। এ দুয়ের মধ্যে আসমান-জমিন তফাৎ।

আমাদের সংগঠনের প্রকৃতিই হচ্ছে এই যে, এখানে দায়িত্বশীলদের যত অধিক দ্ব্যর্থহীন সমালোচনা হয় ততই তা আন্দোলনের জন্য কল্যাণকর হয়। কিন্তু পরিচালকদের সম্পর্কে বিদ্রূপাত্মক শব্দ উচ্চারণ করা, তাঁদের মর্যাদার পরিপন্থী বাক্য ব্যবহার করে মনের ঝাল ঝাড়া, তাঁদের ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করা অথবা তাঁদের দুর্বলতা উল্লেখ করে আনন্দ উপভোগ করা অবশ্যই ইসলামী চরিত্রনীতির পরিপন্থী।

সমালোচনা অধিকারের ওপর কোন আইনের বাঁধন না থাকার কারণে তাকে একটি স্থায়ী কর্মে পরিণত করা, পরিচালকবৃন্দের প্রতিটি নির্দেশ, কর্ম ও সিদ্ধান্তের এবং তাদের প্রতিটি কথার সমালোচনা শুরু করে দেয়া এবং তাঁদের নির্দেশের পক্ষে পূর্ণাঙ্গ যুক্তি প্রমাণ পেশ করার দাবী করাও বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ অবস্থা সৃষ্টি হবার পর এক ব্যক্তি কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করে এক দিনও চলতে পারে না। অতঃপর দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা দলের সাধারণ সদস্যদের সম্মুখে বসে কেবল জবাবদিহিই করতে থাকবে এবং তাদের আস্থা পুণর্বহাল করার জন্য নিজেদের প্রতিটি বাক্য ও কর্মের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে তাদেরকে বুঝাতে থাকবে যে, এর মধ্যে অভিযোগ করার মতো তেমন কোন বিষয় নেই। এ কথাগুলি সম্মুখে রেখে চিন্তা করলে সহজেই উপলব্ধি করা যাবে যে, দায়িত্বশীলদের সমালোচনার ব্যাপারে ন্যায় সংগত পন্থা অবলম্বন করতে হলে যথেষ্ট সতর্ক হতে হবে। আর এ ব্যাপারে সতর্ক না হলে সমালোচনার অধিকারকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করে কর্মীরা সংগঠনের জন্য মারাত্মক ক্ষতিতে পরিণত হতে পারেন এবং এর ফলে তাদের নিজেদের পারিণামও-হতে পারে অত্যন্ত ভয়াবহ।

অন্যায় সমালোচনার একটি বড় আলামত হচ্ছে এই যে, তা আনুগত্যের পথে বাধা সৃষ্টি করে। কোন ব্যাক্তি এ পথে পা বাড়াবার পর প্রকাশ্য অন্যায় আচরণে লিপ্ত হয়। কাজেই আনুগত্য ও সমালোচনার পৃথক পৃথক সীমানা রয়েছে এবং নিজেদের সীমানার মধ্যেই তাদের অবস্থান করা উচিত। আলাহর নাফরমানী ছাড়া আর কোন বস্তু আনুগত্যকে খতম করতে পারে না।

৩। <u>ব্যক্তির পরিবর্তনের কারণে আনুগত্য ব্যবস্থাকে মেনে চলার ক্ষেত্রে কোন প্রকার পরিবর্তন আসতে পারে না</u>। হতে পারে, কোন আন্দোলনের ব্যাপকতর অবস্থায় দায়িত্ব গ্রহণকারী একটি বড় দলের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কতক উচ্চমানের, কতক নিম্নমানের, কারুর জ্ঞান অধিক, কারুর তাক্বওয়া অধিক, কেউ বর্তমান যুগের বিশেষ বিষয়সমূহে অধিক পারদর্শী, কেউ প্রথম যুগের অবস্থা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখেন, কেউ নির্দেশাবলীর বাহ্যিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে অধিক অবগত, আবার কেউ

নির্দেশাবলীর আভ্যন্তরীণ তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী, কারুর নিকট আন্দোলনের একটি দিক অধিক গুরুত্বপূর্ণ, আবার কারো নিকট অন্য একটি দিক গুরুত্বের অধিকারী। আবার এমনও হতে পারে যে, কারুর মেজাজ একটু কঠোর, কারুর কোমল, কেউ অত্যধিক নিঃসংকোচ ভাবকে পছন্দ করেন আবার কেউ একটু ভারিক্কি ধরণের গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যবহারে অভ্যস্ত, কেউ অত্যধিক বাকপটুতাকে পছন্দ করেন, আবার কেউ নীরবে কাজ করার পক্ষপাতি।

এছাড়াও পোশাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহার, চলা-ফিরা, উঠা-বসা প্রভৃতি জীবনের বিভিন্ন ব্যাপারে বিভিন্ন ব্যক্তির রুচি বিভিন্ন হতে পারে। ব্যক্তিগত রুচি, প্রকৃতি ও প্রবণতা একটি দলীয় ব্যবস্থার সামগ্রিক নীতির ঐক্য সত্ত্বেও একটি বিশেষ পর্যায় পর্যন্ত নিজের কাজ করে থাকে। এই পার্থক্য ও বিভিন্নতার কারণে দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের অবস্থার মধ্যে এমন কোন পার্থক্য সূচিত হয় না, যার ফলে তাঁদের আনুগত্যের অধিকারের মধ্যে কম-বেশী করা যেতে পারে এবং তাঁদের মধ্যে কোন রদবদল হলে লোকেরা অনসুন্ধানে প্রবৃত্ত হতে পারে যে, অমুক ব্যক্তির মধ্যে যে রুচি ও মননশীলতা ছিল তা অমুক ব্যক্তির মধ্যে নেই কেন ? কোনো এক ধরনের ব্যবহার ও কর্মপদ্ধতিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠার পর যদি কোন রদবদল অনুষ্ঠিত হয় তাহলে মনের মধ্যে অস্থিরতা দেখা দেয় এবং কর্মের গতি মন্থর হয়ে পড়ে। এই অনাসৃষ্টির দুয়ার বন্ধ করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) হেদায়েত দিয়েছিলেন যে, একজন নাককাটা হাবশীকেও যদি তোমাদের ইমাম করা হয় তাহলে তাঁর নির্দেশ শ্রবণ করো এবং তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য করো। এক্ষেত্রে তাঁর চেহারা সুরত লেবাস-পোশাক রুচি-প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করো না। দায়িত্বশীলদের ব্যক্তিগত রুচি, প্রকৃতি সকল দিক দিয়ে অনুগতদের চহিদানুযায়ী হবে, এ বিষয়টির উপর শরিয়ত আনুগত্যকে নির্ভরশীল করে নি।

ইসলামী আন্দোলন ব্যক্তিত্বের চতুর্দিকে আবর্তিত হয় না। বরং এ আন্দোলন এক সময় রাসূলুল্লাহর (সা) নেতৃত্বে চলতে থাকে এবং অন্য সময় হযরত আবু বকর ছিদ্দিক(রা) কুরআনের এ বাণী–

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ ج قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ط اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْقُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى اَعْقَابِكُمْ ـ

সূরা আলে ইমরান, আয়াত ঃ ১৪৪

(অর্থাৎ ঃ "মুহাম্মদ (সা) একজন রসূল মাত্র ছিলেন। তাঁর পূর্বে আরো বহু রাসূল অতিক্রান্ত হয়েছেন, যদি তিনি মরে যান বা নিহত হন তাহলে কি আবার তোমরা পিছনের দিকে ফিরে যাবে ?") উচ্চারণ করে অগ্রসর হন এবং আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তারপর হযরত উমরের (রাঃ) ন্যায় কঠোর হৃদয়ের ব্যক্তি নেতৃত্ব লাভ করেন। অতঃপর হযরত উসমানের (রাঃ) মত কোমল হৃদয়ের সহনশীল ব্যক্তি এ দায়িত্ব গ্রহন করেন। তারপর হযরত আলী (রাঃ) তাঁর বিশেষ গুণাবলীসহ এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেন। এই সমস্ত হাত বদলের মধ্যে অবশ্যই আনুগত্য ব্যবস্থার অপরিহার্যতা বহাল থাকে এবং এ ব্যবস্থা ভঙ্গ করা হামেশা কবীরা গোনাহর অন্তর্ভুক্ত থাকে।

মনে রাখবেন, আমাদেরকে ব্যক্তিত্বকে সম্মুখে রেখে শৃঙ্খলার আনুগত্য করার জন্য নয় বরং শরীয়ত বিভিন্ন দায়িত্বকে যে মর্যাদা দান করেছে তাকে সম্মুখে রেখে শৃঙ্খলার আনুগত্য করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কাজেই প্রয়োজন ও পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রতিদিন ব্যক্তি বদল হতে থাকলেও, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) আমাদের উপর দায়িত্বশীলদের যে সকল অধিকার দান করেছেন পূর্ণ সততার সাথে আমাদের সেগুলি আদায় করা উচিত।

৪। এ পর্যন্ত কেবল কর্মীদের দায়িত্ব বিবৃত করা হয়েছে। এদের তুলনায় কর্তৃত্বশীলদের দায়িত্ব অনেক বেশী নাজুক প্রকৃতির। কর্তৃত্বশীলগণ তাঁদের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন না করা পর্যন্ত কর্তৃত্ব ও আনুগত্য ব্যবস্থার মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকতে পারে না। কর্মীদের মোকাবিলায় নেতাদের পরকালীন জবাবদিহিও অনেক কঠিন হবে। দুনিয়ায় ইসলামী আন্দোলনের সাফল্যের সিংহভাগও তাঁদের সঠিক ও যথার্থ কর্মের ওপর নির্ভর করে। কর্মীরা তখনই যথার্থ আনুগত্য করতে পারে যখন নেতৃবৃন্দ তাঁদের নিজেদের অংশের কর্তব্য অর্থাৎ কর্তৃত্বের ব্যাপারে তাদের নিজেদের দায়িত্ব পুরোপুরি আদায় করে। এ

ব্যাপারে নিম্নলিখিত আয়াতটি থেকে চমৎকার নির্দেশ পাওয়া যায়। এখানে আল্লাহতায়ালা রাসূলুল্লাহর (সা) কর্তৃত্বের স্বরূপ নিম্নোক্ত ভাষায় ব্যক্ত করেছেন ঃ

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ج وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ص فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ ج فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ٥

“এটা একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহ যে, আপনি এদের (মুসলমানদের) প্রতি কোমল। যদি আপনি কঠোরভাষী ও তিক্ত মেজাজ সম্পন্ন হতেন, তাহলে এরা আপনার চারপাশ থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যেতো। কাজেই এদের ত্রুটিকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখুন, এদের জন্য সাফায়াত চান এবং বিভিন্ন বিষয়ে এদের সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপর পরামর্শের পর যখন কোন বিষয়ে দৃঢ় সংকল্প হয়ে যায়, তখন আল্লাহর উপর ভরসা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ (তার উপর) ভরসাকারীদেরকে ভালবাসেন।” *সূরা আলে ইমরান, আয়াত ঃ ১৫৯*

এই আয়াতে রাসূলুল্লাহর (সা) আনুগত্যকারী প্রত্যেকটি কর্তৃত্বশীল ব্যক্তির জন্য এমন একটি মৌলিক বিধান দান করা হয়েছে যার অনুপস্থিতিতে কোন দলীয় শৃঙ্খলা যথাযথ ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে এই আয়াতের আলোকে যে সমস্ত বিষয়ের অনুগত থাকা উচিত এবং যে বিষয়কে সম্মুখে রেখে নিজের স্বভাব-চরিত্র মেজাজ গড়ে তোলা উচিত তা —নিম্নে বর্ণিত হলো ঃ

ক. ব্যক্তি যেন কোন প্রকার বড়-ছোট, উঁচু-নীচু ভেদাভেদ অনুভব না করে। এ পরিবেশ যেখানে নেই সেখানে কর্তৃত্বশীল ও অনুগতদের মধ্যে মানসিক, আন্তরিক ও বৈঠকী ব্যবধান সৃষ্টি হয় এবং সহযোগিতার প্রাণশক্তি

দুর্বল হয়ে পড়ে। এ মহা সত্যটিকে আল্লামা ইকবাল তাঁর কবিতায় এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

কাফেলার সারি হতে
বিচ্ছিন্ন হলো কেউ,
সংশয়িত হলো কেউ
হারেমের প্রতি,
কেননা ব্যবহার প্রীতিপূর্ণ নয়
আমাদের কাফেলা সালারের।

সংশ্লিষ্ট আয়াতটি এই প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারই দাবী করে।

এই প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারের অর্থ এই নয় যে, দায়িত্বশীল ব্যক্তি কোন ব্যাপারে কঠোর হবেন না, কোন ভুলত্রুটির জন্য কৈফিয়ত চাইবেন না, কোন অন্যায় কাজে বাধা দিতে পারবেন না, উপরন্তু প্রত্যকটি কর্মীর তোষামোদ করে ফিরবেন। বরং পরিস্থিতি ও পরিবেশ অনুযায়ী কোথাও কঠোর নীতি অবলম্বন করার প্রয়োজন হলে সেখানে তা না করলে আন্দোলনের জন্য ক্ষতিকর হবে। আদর্শ, উদ্দেশ্য ও শৃঙ্খলার খাতিরে দায়িত্বশীলদেরকে কখনো কখনো সহযোগীদের সাথে আদেশের সুরে কথা বলতে হয়, কাজ আদায় করতে হয়। কিন্তু সে আদেশে থাকবে স্নেহ প্রীতির প্রাণ প্রবাহ। তার বাইরের কঠোরতা নেহায়েত একটা খোলস বই আর কিছুই নয়।

খ. দায়িত্বশীলগণ সকল সহযোগীর উঠা-বসা, চাল-চলন আচার-ব্যবহার, হাব-ভাব প্রভৃতি গভীরভাবে নিরীক্ষণ করার সুযোগ পান। কাজেই তাদের অনেক দোষ-ত্রুটি, দুর্বলতা, গলদ তাঁদের সম্মুখে থাকে। হয়ত কেউ কর্তব্য পালনে গাফলতি করেছে, কেউ আন্দোলনের বিরোধীদেরকে কোন অপ্রীতিকর কথা বলেছে, কেউ ত্রুটিপূর্ণ আবেগ প্রকাশ করেছে, কেউ সর্বসমক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গোপন কথা প্রকাশ করে দিয়েছে, কেউ নিজের সহযোগী বা অন্যের সাথে অন্যায় আচরণ করেছে, কেউ গীবত করেছে, কেউ কারুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে।

এ সমস্ত বিষয় সামনে থাকার কারণে মানুষের মনে কুধারণা, তিক্ততা ও বিরক্তি সৃষ্টি না হয়ে পারে না। এ ধরনের দুর্বলতা দেখে ধীরে ধীরে দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের মন বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের সম্পর্কে এবং নিজেদের সমগ্র দলটি সম্পর্কেও তিক্ত হয়ে উঠে। তখন কঠোর কিন্তু কর্কশ ব্যবহার ও কথাবার্তার মাধ্যমে এক ধরনের বিরক্তি ফুটে উঠতে থাকে। এর ফলে মন ভেঙে যায়, সন্দেহ-সংশয়ের পরিধি বেড়ে যায় এবং কর্তৃত্ব ও আনুগত্যের বাঁধন ঢিলে হতে থাকে। পূর্বোল্লেখিত আয়াতটি এ ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে। এর মাধ্যমে কর্তৃত্বশীলদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে ঃ নিজের সহযোগীদের দুর্বলতাগুলি দেখো এবং সেগুলি মাফ করে দাও, এজন্য মনকে কলুষিত করো না এবং নিরাশ হয়ো না। কারণ বিভিন্ন মানুষের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার দুর্বলতা আছে। অনেক প্রচেষ্টা, মেহনতের পর ধীরে ধীরে এগুলি দূরীভূত হয়। কেবল তাদেরকে মাফ করে দেয়াই যথেষ্ট নয় বরং স্নেহ প্রীতির তাগিদে অনুপস্থিতিতে তাদের জন্য আল্লাহর কাছে মাগফেরাত চাইতে হবে। এটিই হচ্ছে পারস্পরিক প্রীতির সম্পর্ক শক্তিশালী করার সর্বোত্তম উপায়।

গ. 'আর বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করো'—নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সময়ে সময়ে এবং প্রয়োজনবশতঃ নিজেদের বিভিন্ন সহযোগীর সাথে তাদের বুদ্ধি-বিচক্ষণতা, জ্ঞান ও তাকওয়া অনুযায়ী পরামর্শ করা উচিত। পরামর্শের মাধ্যমে পারস্পরিক আস্থা বৃদ্ধি পায়, সন্দেহ-সংশয় দূরীভূত হয় এবং সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করা সহজ হয়।

পরামর্শ করা অবশ্যই ফরজ। যে ব্যাপারে যে সহযোগী সঠিক পরামর্শ দেয়ার যোগ্যতা রাখে সে ব্যাপারে তার সাথে পরামর্শ করাই হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ। প্রত্যেক ব্যাপারে প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করা জরুরী নয় বরং যে ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করা সঙ্গত তার সাথে অবশ্য সে ব্যাপারে পরামর্শ করা উচিত। অনেক সময় বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের সাথে, অনেক সময় কেবল নির্বাচিত 'কার্যকরী-পরিষদ'এর সাথে আবার অনেক সময় সাধারণ সদস্য ও সহযোগীদের সাথে পরামর্শ করা, অতঃপর তাদের মতামত সম্পর্কে

চিন্তা ও বিচার-বিশ্লেষণ করা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা ও সংগ্রামকে শক্তিশালী করে। উপরন্তু এর সাহায্যে দলীয় সংগঠন মজবুত হয়। পরামর্শের মাধ্যমে বিভিন্ন মন মস্তিষ্কের মিলন ঘটে, তাদের মধ্যে ঐক্য সংস্থাপিত হয় এবং তারা বিভিন্ন বিষয়ে গৃহীতব্য সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

ঘ. কর্তৃত্বশীলদের জন্য আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতের মধ্যে যে সর্বশেষ নির্দেশ দিয়েছেন, তা হচ্ছে এই যে, প্রয়োজনীয় পরামর্শের পর যখন কোন বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তখন একাগ্রচিত্তে তার উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকা উচিত। একটি দলের দায়িত্বশীলদের প্রতিদিনকার বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পরও মতবিরোধের সম্মুখীন হতে হয় এবং অনবরত নতুন নতুন মতামত তাঁদের সম্মুখে আসতে থাকে। কিন্তু স্থিরীকৃত বিষয়ে যদি বরাবর রদবদল করা হয় তাহলে সে ব্যাপারে সাফল্যের সাথে কোন একটি দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয় বরং উল্টা দায়িত্বশীলদের মনে ইতস্তত ও চিন্তার নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়। এর ফলে দলের সামগ্রিক নীতিও স্থায়ী অস্থিরতার শিকার হয়। এ সমস্ত কারণে যথারীতি একটি পরিণতিতে পৌঁছে যাবার পর আল্লাহ তায়ালা পরামর্শ দানকারী ব্যক্তিদেরকে স্থিরীকৃত বিষয়সমূহ মেনে নিয়ে নিজেদের বাস্তব দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন।

৫। কর্তৃত্ব ও আনুগত্য সম্পর্কে আরো বক্তব্য হচ্ছে এই যে ঃ

ক. বিভিন্ন দায়িত্বশীল ব্যক্তির পক্ষ থেকে যে সমস্ত সার্কুলার ও নির্দেশনামা জারি করা হয় সাধারণত সেগুলির আনুগত্যের ব্যাপারে শরীয়ত নির্ধারিত অপরিহার্যতার অনুভূতি কিছুটা দুর্বল। এই সার্কুলার ও নির্দেশগুলিকে সম্ভবত অফিস-আদালতের মামুলি সার্কুলার মনে করা হয়। অথচ যখনই কোন সার্কুলার জারি করা হয় তার অবস্থা হয় ঠিক *'আমর বিল মারুফ'* (সৎকর্মের আদেশ দান)-এর সমতুল্য। এ ব্যাপারে *'উলিল আমরের'* (কর্তৃত্বশীলদের) আনুগত্যকে অপরিহার্য গণ্য করা হয়েছে। সার্কুলারগুলির প্রতিটি শব্দ সম্পর্কে ভালভাবে চিন্তা করা উচিত এবং যে বন্দেগীর প্রেরণা নিয়ে শরীয়তের সমস্ত

বিধি-নিষেধ পালন করা হয় সেই প্রেরণা সহকারে যথাসময়ে সেগুলিকে কার্যকরী করার জন্য নিজের সমগ্র শক্তি নিয়োগ করা উচিত।

খ. সভায় উপস্থিতির জন্য যে সময় নির্ধারিত করা হয়, কোন ডিউটিতে পৌঁছাবার জন্য যে সময়-কাল স্থিরীকৃত হয়, অনুরূপভাবে কোন সংবাদ বা রিপোর্ট পৌঁছাবার বা কোন হুকুম তামিল করার জন্য যে পদ্ধতি বা সময় নির্ধারিত হয়, তা যথাযথ মেনে চলার যোগ্যতা এখনো আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় নি।

লোকেরা এখনো এ দায়িত্ব পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারছে না যে, তাদের প্রত্যেকেই একটি ঘূর্ণায়মান মেশিনের কলকজা স্বরূপ এবং প্রতিটি কলকজা যদি নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করতে বিলম্ব করে অথবা অনিয়ম করে তাহলে সমগ্র মেশিনটাই যথাসময়ে কাজ করতে ব্যর্থ হবে। এ পঙ্গুত্বসহ আমরা কোন বড় অভিযানে সফল হতে পারবো না। কাজেই আমাদের প্রত্যেকেরই সংগঠন-মেশিনের কলকজার ন্যায় যথা নিয়মে কাজ করার জন্য নিজেদেরকে তৈরি করা উচিত।

গ. কর্তৃত্ব ও শৃঙ্খলা ব্যবস্থার আনুগত্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি যে একটি গোনাহর শামিল উপরের আলোচনায় এ কথা সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে। এজন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে আমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। কিন্তু মনে হয়, এ ধরনের ত্রুটি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করলে সহযোগীরা কিছুটা লজ্জিত হয় ঠিকই, তবে এ জন্য তাদের মধ্যে সাধারণভাবে যে ধরনের গুনাহর অনুভূতি সৃষ্টি হওয়া দরকার তা হয় না। দলীয় শৃঙ্খলার আনুগত্যে ত্রুটি করা– মিথ্যা বলা, কাউকে গালি দেয়া, ওয়াদা ভঙ্গ করা, কারুর অধিকার আত্মসাৎ করা, চুরি করা, গীবত করা, মিথ্যা সাক্ষী দেয়া এবং এ ধরনের অন্যান্য বড় বড় অপরাধের চাইতে কম পর্যায়ের নয়। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য ব্যাপার ব্যক্তিগত চরিত্রের নীতি বিরোধী উপরোল্লেখিত কাজগুলি করার সঙ্গে সঙ্গেই মনে খটকা লাগে এবং আল্লাহর নিকট তওবা ও ইস্তেগফার করার প্রেরণা জাগে, অথচ দলীয় চরিত্রনীতি বিধ্বস্ত হবার পর এমন গোনাহগারীর কোন অনুতাপের ভাব

মনের মধ্যে সৃষ্টি হয় না যার ফলে সঙ্গে সঙ্গেই তওবা ও ইস্তেগফার করে নিজের কার্যাবলী সংশোধন ও ক্ষতিপূরণ করা যেতে পারে।

দলীয় চরিত্রের মূল্য ব্যক্তিগত চরিত্রের চাইতে অনেক বেশী। এ জন্যই দলীয় চরিত্রে দুর্বলতার প্রকাশ বৃহত্তর গোনাহ। আমাদের সহযোগীদের এ বিষয়টি অনুভব করা উচিত। আরো যদি সংগঠন কর্তৃক অর্পিত কোন দায়িত্ব সম্পাদন করতে, কোন কাজের জন্য সময় বের করতে, কোন নির্দিষ্ট স্থানে যথাসময়ে পৌঁছতে অথবা অন্যদিকে দায়িত্বশীলদের অধিকার আদায় করতে, তাঁদের কল্যাণ কামনার দাবী পূরণ করতে, সঠিক সমালোচনা পদ্ধতি অবলম্বন করতে, পরামর্শ ও তথ্যদান করতে, গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার আদায় করতে বা দায়িত্বশীলদের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করতে কোন প্রকার ত্রুটি করে; তাহলে এমনি ধরনের প্রত্যেকটি ত্রুটির পর আমাদের মনে চরম লজ্জানুভূতি সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন। এমন লজ্জানুভূতি সৃষ্টি হবে যা আমাদের তওবা ইস্তেগফারের দিকে ঝুঁকিয়ে দেবে, রাব্বুল আলামীনের সম্মুখে আমাদের দীনতার শির নত করে দিবে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃত্বশীল বা সহযোগীদের নিকট ওজর পেশ করা ও ক্ষমা চাওয়ার জন্য আমাদের মধ্যে অধিকতর কর্মতৎপরতা সৃষ্টি করবে এবং আমাদের আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করার প্রেরণা জাগাবে।

আমাদের মধ্যে এ গুণ সৃষ্টি না হলে ইসলাম নির্ধারিত পথে নিজেদের সংগঠন ও শৃঙ্খলার বিকাশ সাধনও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

ঘ. কর্তৃত্ব ও আনুগত্যের উপরোল্লেখিত দাবীসমূহ পূরণ করার জন্য নিছক আবেদন বা কতিপয় গণতান্ত্রিক ও শাসনতান্ত্রিক ধারা যথেষ্ট নয়। বরং একমাত্র সহযোগীদের দায়িত্বানুভূতিই এ দাবীগুলির পূর্ণতার ধারক হতে পারে। যদি প্রত্যেক সহযোগী আন্দোলনের সাথে সম্পর্ক কায়েম করে মুমিনদেরকে সাক্ষী রেখে আল্লাহর নিকট যে অঙ্গীকার করেছে তা সবসময় মনের মধ্যে জাগরুক রাখে, তাহলে তাদের মাঝে এ দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত থাকতে পারে। এই অনুভূতির তাগিদে প্রত্যেক সহযোগীকে এ কথা মনে রাখা দরকার যে, সংগঠন শৃঙ্খলা হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে একটি আমানত এবং তার সাথীদের ন্যায় তাকেও এর প্রহরায় ও

রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করা হয়েছে। এটি একটি মহামূল্যবান আমানত। এই আমানতটিকে অস্তিত্ব দান করার জন্য ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে হাজার হাজার শক্তি কাজ করেছে এবং এর পেছনে বহু চিন্তা-গবেষণা, শ্রম, অর্থ, নিদ্রাহীনতা, প্রচেষ্টা, সংগ্রাম ও ত্যাগ রয়েছে। কাজেই কোনো ব্যক্তি যদি এই শৃঙ্খলায় কোন প্রকার দুর্বলতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে তাহলে তার হস্তক্ষেপ থেকে এ আমানতকে রক্ষা করা প্রত্যেক সহযোগীর প্রাথমিক দায়িত্ব। এই দায়িত্ব সম্পাদনে যারাই ত্রুটি করবে তারাই সেই পাহারাদারের ভূমিকা গ্রহণ করবে যে নিজের কাজে ফাঁকি দেয়।

কাজেই সহযোগীদের উচিত এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং এমন একটি ঐতিহ্য সৃষ্টি করার জন্য অবিশ্রাম প্রচেষ্টা চালানো, যার ফলে শৃঙ্খলার ওপর প্রভাব বিস্তারকারী কোন ক্ষতিকর বস্তু মাথা উঁচু করতে না পারে। আর কোন অপ্রীতিকর বস্তু মাথা উঁচু করলেও যেখানে মাথা উঁচু করে সেখানেই যেন তাকে ভালোভাবে দাবিয়ে দেয়া যায়। একমাত্র এ পদ্ধতিতেই কর্তৃত্বশালী ও আনুগত্যকারীরা স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করে কুরআন ও সুন্নাহর দাবী অনুযায়ী অগ্রসর হতে পারে।

সহযোগীদের সাথে সম্পর্ক

যে সমষ্টিগত পরিবেশে ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্ক যথার্থ নৈতিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় একমাত্র সেখানেই ইসলামের চাহিদা অনুযায়ী কর্তৃত্ব ও আনুগত্য যথাযথভাবে প্রবর্তিত হতে পারে। এই নৈতিক ভিত্তিগুলিকে আল্লাহ তাঁর রাসূল (সাঃ) দ্বারা যথাযথভাবে নির্ধারণ করেছেন। বিশেষ করে সূরায়ে হুজরাতে এই গুরুত্বপুর্ণ নীতিগুলি সংক্ষেপে বিবৃত করা হয়েছে। ইসলামী সমাজ ও ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের এগুলি সম্মুখে রাখা প্রয়োজন। এইখানে আমি সংক্ষেপে এর উল্লেখ করছি।

১। সমাজ জীবনকে ত্রুটিশূন্য রাখার জন্য প্রথম নির্দেশ হচ্ছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ۝

"হে ঈমানদারগণ! যদি কোন ফাসেক ব্যক্তি তোমাদের নিকট কোন খবর নিয়ে আসে, তাহলে (সে সম্পর্কে চিন্তা গ্রহনের পূর্বে) অনুসন্ধান করো, যাতে করে তোমরা অজ্ঞাতে (বিক্ষুব্ধ হয়ে) কোন দলের ওপর আক্রমণ না করো এবং পরে এ জন্য পস্তাতে না হয়।" *সূরা হুজরাত, আয়াত ঃ ৬*

কোন খবর বা বিবরণ শুনার পর সঙ্গে সঙ্গেই সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অনেক সময় মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করে। এই ধরনের ভুলের কারণে পরে লজ্জিত হতে হয়। এ নির্দেশটি অত্যন্ত ব্যাপক। ইসলামী সমাজের সদস্যদের এর ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকা উচিত। ফাসেকদের প্রদত্ত খবরে পরস্পরের সম্পর্কে তড়িৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত নয়।

২। দ্বিতীয় নির্দেশ হচ্ছে ঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۔

"ঈমানদারেরা পরস্পর ভাই ভাই। কাজেই নিজের ভাইদের মধ্যে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত করো।" *সূরা হুজরাত, আয়াত ঃ১০*

এ নির্দেশটির উদ্দেশ্য অত্যন্ত পরিষ্কার। মুসলিম সমাজের সদস্যদের মধ্যে মানবিক দুর্বলতার কারণে যদি কখনো মনোমালিন্য, ঝগড়া-বিবাদ দেখা দেয়, তাহলে ফেতনাকে আরো ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বড় করা অন্য ভাইদের কাজ নয়। বরং তাদের কাজ হচ্ছে সন্দেহ-সংশয় দূর করা, বিবাদমান পক্ষদ্বয়কে

নিকটতর করা এবং উত্তেজনা প্রশমিত করার জন্য চেষ্টা চালানো, যার ফলে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক পুনর্বহাল হতে পারে। কেননা এই ভ্রাতৃত্ব ছাড়া ইসলামী দলের সংগঠন শৃঙ্খলা কোন দিন মজবুত হতে পারে না।

৩। তৃতীয় নির্দেশ হচ্ছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ . وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ . وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ - بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ . وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ .

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের একদল যেন অন্য দলের প্রতি বিদ্রুপ না করে, কেননা হতে পারে তারা এদের তুলনায় ভালো লোক। আর তোমাদের মেয়েরা যেন অন্য মেয়েদের বিদ্রুপ না করে, কেননা হতে পারে তারা এদের তুলনায় ভালো। আর তোমরা পরস্পরের দোষ খুঁজে বেড়িয়ো না, পরস্পরের জন্য অসম্মানজনক নাম ব্যবহার করো না। কেউ ঈমান আনার পর তাকে মন্দ নামে ডাকা গোনাহ্। এসব কাজ থেকে যারা তওবা করে না তারা জালেম।"

সূরা হুজরাত, আয়াত ঃ ১১

এ নির্দেশের মাধ্যমে বিদ্রুপ করা, পরস্পরের দোষ খুঁজে বেড়ানো এবং অসম্মানজনক নাম ব্যবহার করা থেকে মুসলমানকে বিরত রাখা হয়েছে এবং এজন্য সতর্কবাণী শুনানো হয়েছে যে, যারা এ অভ্যাস পরিত্যাগ করবে না তারা সৎ মুমিনদের দলভুক্ত হবে না, বরং হবে জালেমদের দলভুক্ত। এ দোষগুলি সমাজদেহে ঘুণ ধরিয়ে দেয়। এই ছোট দোষগুলি মনে ভাঙ্গন ধরায়। যে দলে ঠাট্টা-বিদ্রুপ, কটাক্ষ, মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করা, অসম্মান করা

প্রভৃতি রোগ সৃষ্টি হয় সে দল কখনো ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের উন্নততর পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। আমাদের প্রত্যেক কর্মীর এই রোগসমূহ থেকে মুক্ত থাকার জন্য চেষ্টা করা উচিত।

৪। চতুর্থ নির্দেশ হচ্ছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ـ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ـ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ـ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ـ وَاتَّقُوا اللَّهَ ـ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ـ

"হে ঈমানদারগণ! খুব বেশী কু-ধারণা পোষণ থেকে বিরত থাক। কেননা অনেক কু-ধারণা গোনাহর নামান্তর। অন্যের অবস্থা জানবার জন্য গোয়েন্দাগিরি করো না এবং কারুর গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি নিজের মৃত ভায়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে ? (না, করবে না) বরং তোমরা তা ঘৃণা কর। আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ তওবা কুবলকারী ও দয়াময়।"

সূরা হুজরাত, আয়াত ঃ ১২

এ আয়াতটির প্রথম দাবী হচ্ছে এই যে, মুসলিম দলের সদস্যদের পরস্পরের সম্পর্কে কু-ধারণা করা যাবে না। মনের মাটিতে সন্দেহ-সংশয়ের বীজ বপন করা যাবে না। পরস্পরের বিরুদ্ধে দোষারোপ করা এবং এদিক-ওদিক থেকে শুনে শুনে কারুর বিরুদ্ধে দোষের পাহাড় গড়ে তোলা যাবে না, কেননা প্রত্যেকটি ভিত্তিহীন সন্দেহ-সংশয় ও দোষারোপ আসলে একটি গোনাহ।

এর দ্বিতীয় দাবী হচ্ছে এই যে, পরস্পরের গোপনীয়তা জানার জন্য গোয়েন্দাগিরি করা যাবে না। গোয়েন্দাগিরির অর্থ এই যে, পরস্পরের

দোষখুঁজে বেড়ানো বা গোপন কথা জানার জন্য সর্বত্র ঢু-মারা অথবা বিভিন্ন মজলিসের ভেতরের কথা জানার জন্য তৎপর থাকা। এগুলি অত্যন্ত দোষণীয় এবং শৃঙ্খলার জন্য ধ্বংসকর।

এর তৃতীয় দাবী হচ্ছে এই যে, একজনের অনুপস্থিতিতে অন্যের দোষ বর্ণনা করে আনন্দ উপভোগ করা যাবে না। কেননা এটা মারাত্মক অপরাধ। এটা হচ্ছে যে ব্যক্তির গীবত করা হয় তার গোশত কেটে খাওয়ার তুল্য ঘৃণ্য অপরাধমূলক কাজ। এই দাবীগুলোর প্রতি যত অধিক নজর রাখা হবে ততই আন্দোলনের ঐক্য ও সহযোগীদের ভ্রাতৃত্ব শক্তিশালী হবে এবং কর্তৃত্ব ও আনুগত্য ব্যবস্থা যথাযথভাবে কাজ করতে সক্ষম হবে।

দলীয় চরিত্রের সাথে সম্পর্কিত আরো কতিপয় বিষয় সূরায়ে হুজরাতে আছে। আপনারা ইচ্ছা করলে সেগুলি সম্পর্কেও চিন্তা করতে পারেন। এখানে মাত্র কতিপয় সুস্পষ্ট নৈতিক দাবী পেশ করা হল।

পরিশেষে বলা যায়, যদি আমরা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক কায়েমের যথাযথ ব্যবস্থা করে দলীয় নীতি ও শৃঙ্খলার আনুগত্য করি এবং উল্লেখিত নৈতিক গুণাবলী নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ি, তাহলে ইনশাআল্লাহ আমাদের ব্যর্থতার সামান্যতম সম্ভাবনাও নেই। আল্লাহ যদি আমাদেরকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার তিনটি সুযোগ দেন তাহলে বিশ্বাস করুন, আমরা ব্যবসায় যে পুঁজি খাটাচ্ছি তা কয়েক গুণ অধিক মুনাফা দানে সক্ষম হবে।